ভাষাপ্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও জিন্নাহ

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

ভাষার ব্যাপারে মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বা শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি বিবিধ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬২-১৯৪১), মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮)-উপমহাদেশের এই তিনজন প্রভাবশালী ব্যক্তির আকর্ষণীয় বক্তব্য রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক রচনায় মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মাতৃভাষা তাঁর কাছে মাতৃদুগ্ধের মতো স্বাস্থ্যদায়ক। মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর কথা ইংরেজির মতো বিদেশী ভাষা এ দেশের জনসাধারণ কোনো দিন সহজে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আলো প্রতিটি ঘরে পৌঁছানো যাবে না। তবে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে বলেছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। ১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে মাতৃভাষা ও ইংরেজির সম্পর্কে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে : স্যর রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে দক্ষতার সাথে সর্বত্র শিক্ষা দিতে হবে, তবে স্কুলে (কলেজেও ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী মান পর্যন্ত) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তাঁর এই বিশ্বাসের চারটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের গভীরতম শিক্ষা লাভ করে। দ্বিতীয়ত উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রদের সবাই যে ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে তা নয়। তৃতীয়ত ইংরেজি ভাষা শিখেও অনেকে ওই ভাষায় সত্যিকারের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। একজন মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য যে শক্তি লাগে তা অন্য একটি কঠিন ভাষা শিখতেই নিঃশেষ করে ফেলে। চতুর্থত মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া প্রশিক্ষণ মেয়েদের শিক্ষার ভার লাঘব করবে। যাঁদের গভীরতর সংস্কৃতি ভারতের জন্য ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

তিনি মনে করেন ব্যাপক শিক্ষার বিকিরণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম সংস্কৃতির মূল বিষয়গুলো সকল বাঙালি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, তবে স্কুলে দেশী ভাষার অধিকতর ব্যবহারের দ্বারাই এটা কেবল সম্ভব।

ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সর্বত্র শিক্ষা দিতে হবে দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর মতে, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। তবে তিনি পরিষ্কার করে বলেন, দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র। কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথের নিকট জাতীয়তাবাদ ছিল একটা ভৌগলিক অপদেবতার মতো। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য সব দরজা-জানালা খুলে রাখতে চান। অসহযোগ আন্দোলনের সময় জগদানন্দ রায়কে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে বলেন, "যে মানুষ নিজের বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে তুলে দেওয়াল গাঁথা শুরু করে, সে যে নিজের বাড়িকে ভালোবাসে এ কথা মিথ্যা।...সেদিন যখন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেওয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজে কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে করছি-আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিস্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি-এ কথা ভুলছি, যে-সব দুর্দান্ত জাতি পরকে আঘাত করে' বড় হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জন করে' স্বেচ্ছাপূর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য।"

এই পত্রের প্রতি গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি কোনো প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ না করে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লেখেন, 'আমি চাই যত অবারিতভাবে সম্ভব সমস্ত দেশের সংস্কৃতি আমার বাড়ির চারপাশে প্রবাহিত হোক। কিন্তু কেউ আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই মানব না। একজন জবরদখলদার, একজন ভিক্ষুক অথবা একজন ক্রীতদাস রূপে আমি অন্যদের গৃহে বসবাস করতে চাই না। ভুয়া অহমিকা অথবা সন্দেহজনক সামাজিক ইজ্জতের দরুন আমি আমার ভগিনীদের উপর ইংরেজি শিক্ষার জন্য অপ্রয়োজনীয় জবরদস্তি চালাতে চাই না। আমি চাইব আমাদের সাহিত্যরসিক সমস্ত যুবক-যুবতী তাদের ইচ্ছামত ইংরেজী এবং বিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষা শিক্ষা করুন এবং এও আমার প্রত্যাশা যে, একজন বসুর (জগদীশচন্দ্র) মত, একজনের রায়ের (প্রফুল্লচন্দ্র) মত, অথবা স্বয়ং কবির মত তারা তাদের শিক্ষার ফসল ভারতবর্ষ ও সারা বিশ্বকে দান করবেন। কিন্তু আমি চাইব না কোন একজনও ভারতীয় তার মাতৃভাষা ভুলে যাক, বা অবজ্ঞা করুক, বা তজ্জন্য লজ্জাবোধ করুক; অথবা তাদের সর্বোত্তম ভাবনারাশি মাতৃভাষায় চিন্তা অথবা প্রকাশ করতে তারা অপারগ, এমন ভাবনায় তারা উদ্বুদ্ধ হোক এও আমি চাইব না।'

গান্ধী মনে করতেন নিজের মাতৃভাষাকে ছোট করা তো নিজের মাকে ছোট করা। ভারতের গৌরব প্রকাশে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দেরকে ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের কথা বলেন যখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেন বা লেখালেখি করেন। যেকোনো জাতি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে মূল্য দিলে নিজের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে এবং তা নিয়ে গৌরব করতে হবে। গান্ধী তাঁর প্রথম প্রধান বই *হিন্দ স্বরাজ* হিন্দিতে লেখেন।

অল ইন্ডিয়া কমন স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড কমন ল্যাংগুয়েজ কনফারেন্সে গান্ধী হিন্দিকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য জোর দেন। তিনি বলেন, 'যখন তিনি ইংরেজি বলেন, তখন তাঁর মনে হয় 'আমি একটা পাপ করছি।' এ-ধরনের পাপবোধ রবীন্দ্রনাথ বা জিন্নাহর ছিল না।

ভারতীয় ঐক্যের প্রশ্নটা বরাবরই বেশ প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। ১৩৩০ সালে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তা কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়।'

তিনি আরো বললেন, 'আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি, তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।'

যখন ভারতীয় মাতৃক্রোড়ের জন্য হিন্দির সুপারিশ করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথকে হিন্দিবিরোধী অভিমত প্রকাশ করার অনুরোধ করা হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।

তিনি ১৩৩০ সালে সভাপতির ভাষণে বলেন, 'ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা। কারণ সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।'

হিন্দি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে, যে-কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে-হিন্দিভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষ মাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময় আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। মা বিদ্বিষাবহৈ।'

১৯২৭ হিন্দিসাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'হিন্দিভাষা ভাবী রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রভাষা কেবল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তায় সিদ্ধ হয় না, সাহিত্যের দিক তার উপযোগিতা দেখাতে হবে। ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কেবল সাহিত্যের দাবি পূরণ করে মেটানো যায়।'

১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে উর্দুকে ভারতের মুসলমানদের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়। বঙ্গপ্রদেশের প্রতিনিধিরা জোর আপত্তি তোলেন। জিন্নাহর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অবশেষে প্রস্তাবটি পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'যেখানে উর্দু একটি অঞ্চলের ভাষা সেখানে উর্দুর নির্বাধ উন্নয়ন ও ব্যবহার বহাল থাকবে এবং যেখানে তা প্রধান ভাষা নয় সেখানে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে উর্দু শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ ভারতের গুজরাতের হরিপুরাতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, 'জাতীয় সংহতির জন্য আমাদেরকে আমাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা ও একটি সাধারণ বর্ণমালার উন্নতি বিধান করতে হবে...আমি মনে করি হিন্দি ও উর্দুর মধ্যকার পার্থক্য কৃত্রিম। সবচেয়ে স্বাভাবিক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হতে হবে ওই দুইয়ের মিশ্রণ যেভাবে দৈনন্দিন জীবনে দেশের বৃহৎ অংশে কথা বলা হয় এবং এই সাধারণ ভাষা নাগরী ও উর্দু দুই লিপিতেই লেখা যেতে পারে।'

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ *পূর্বাশার* সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক চিঠিতে বলেন, 'কংগ্রেস সভাপতি হিন্দিকেই রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বাঙালীর কি দুঃখিত হবার কারণ নেই? বহুসমৃদ্ধ বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হল কোন্ অপরাধে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত প্রার্থনা করি।'

ওই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলা ভাষাকে কংগ্রেস যদি বিশ্বভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য না করে-তাহলে এ নিয়ে আমি আপত্তি করতে পারব না। কংগ্রেসের কর্তব্য কংগ্রেসের হাতে। আমি সভ্যশ্রেণীতেও নেই।-তোমরা যদি বৃথা চেষ্টা করতে চাও কোরো-তোমাদের বয়স অল্প, যথেষ্ট সময় আছে।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র সংখ্যা-৬, ১৬, চিঠিপত্র, পৃ. ২৩০)

বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। প্রত্যন্ত এক প্রদেশের ভাষাকে 'বিশ্বভারতে'র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না।

জিন্নাহ ও গান্ধী উভয়েই বলেছিলেন যে, প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে গান্ধী হিন্দির এবং পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে জিন্নাহ উর্দুর জন্য ওকালতি করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাকাপোক্তভাবে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কালে কংগ্রেস হিন্দিকে এবং মুসলিম লীগ উর্দুর সুপারিশ করা শুরু করে। এই ব্যাপারটা বেশ গভীরে পৌঁছেছিল। তাই জিন্নাহ

যখন বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'-তখন তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতায় জিন্নাহ আশ্চর্যান্বিত হন। ভাষার ব্যাপারে জিন্নাহর তেমন কোনো ভাবাবেগ ছিল না। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় তেমন কোনো দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করেননি। কেজো লোক জিন্নাহর কাছে গ্র্যাজুয়েটের চেয়ে টাইপিস্টের মূল্য বেশি ছিল। ভাষার ব্যাপারেও তিনি মনে করেন, তিনি তাঁর সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করেছেন যখন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি উর্দুর জন্য সুপারিশ করেন।

ভারতের সংবিধানের ৩৪৩(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি হচ্ছে সরকারি ভাষা। সংবিধান প্রবর্তনার ১৫ বছরের মধ্যে ইংরেজির জায়গায় হিন্দিকে প্রতিস্থাপিত করার যে কথা ছিল তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সরকারি আইনে ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ইংরেজি ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যেক রাজ্য অবশ্য রাজ্যের কর্মকাণ্ডের জন্য নিজস্ব সরকারি ভাষা নির্বাচন করতে পারে। যেকোনো সংক্ষুব্ধ নাগরিক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের যেকোনোটির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও পরবর্তী ২০ বছর অফিসে ইংরেজির চালু রাখার বিধান থাকে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বলা হয় ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন নিয়োগ করবেন সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি সরানোর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয় 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। দেশে আইন বাংলা ভাষায় প্রণীত হচ্ছে। উচ্চ আদালতে এখনো ইংরেজির ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। আমরা প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারির দিন সারা দেশে সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলনের অঙ্গীকার করে থাকি। সেই অঙ্গীকার পালনের ক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোনো চাড় নাই।